2006

জামাতের ব্যবস্থাপনায়
কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক
১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১ নান্সপিট (Nunspeet)
হল্যান্ডে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা
এবং
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর
৫ই ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখের
জুমুআর খুতবার আলোকে

জামাতের ব্যবস্থাপনায়
কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক
১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১ নান্সপিট (Nunspeet)
হল্যান্ডে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা
এবং
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর
৫ই ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখের
জুমুআর খুতবার আলোকে

প্রকাশক
মাহবুব হোসেন
সেক্রেটারী প্রকাশনা
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড ঢাকা ১২১১

অনুবাদক আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুরব্বী সিলসিলা
ও
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৯৯
মে ১৯৯২

দ্বিতীয় সংস্করণ
১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪১১ সাল
৬ রবিঃ সানি ১৪২৫ হিঃ
২৭ মে ২০০৪ ইং

তৃতীয় সংস্করণ ঃ
মাঘ - ১৪১২ সাল
মহররম - ১৪২২ হিঃ
ফেব্রুয়ারী - ২০০৬ ইং

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েটস
৫৬/৫, ফকিরেরপুল বাজার
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

বিষয় সূচী

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	মজলিসে আমেলার মিটিং-এ ভদ্রতা ও শালীনতা বজায় রাখা আবশ্যক	৬
২।	কেবল ঘনিষ্ঠজন ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে একে অপরকে সমর্থন করা পাপ বিশেষ	৬
৩।	তাকওয়ার আলোকে প্রত্যেক সদস্যের মতামত পেশ করার স্বাধীনতা আছে	৭
৪।	অন্ধভাবে আমীরের মতামতের সমর্থন করার নাম আনুগত্য নয়	৮
৫।	খোদার দল, না আমীরের দল?	৮
৬।	তাকওয়া বিবেক-বুদ্ধিকে পূর্ণতা দান করে	৯
৭।	পরামর্শ গ্রহণকালেও তাকওয়াকে প্রাধান্য দেয়া কর্তব্য	১০
৮।	নির্বাচিত সকল পদের উর্ধ্বে আমীরের পদ	১১
৯।	গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও জামাতী নির্বাচনের পাথক্য	১১
১০।	আমীরের প্রশাসনিক ক্ষমতা	১২
১১।	আর্থিক বিষয়ে মজলিসে আমেলার ক্ষমতা	১২
১২।	জামাতের আর্থিক ব্যবস্থা সুরক্ষিত করা আবশ্যক	১৩
১৩।	আনুগত্যের প্রকৃত মর্ম	১৪
১৪।	টাকা উঠানোর বিষয়ে নতুন নির্দেশনা	১৫
১৫।	বাজেটভুক্ত বিভিন্ন খাতের তদারকি	১৬
১৬।	মূল বাজেট পরিবর্দ্ধন করার ক্ষমতা মজলিসে আমেলার নেই	১৮
১৭।	চলতি বাজেটভুক্ত বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করার ক্ষমতা মজলিসে আমেলা রাখে	১৮
১৮।	উপরোক্ত বক্তব্যের সারাংশ	২০
১৯।	আমীরের বিশেষ ক্ষমতা এবং প্রয়োগের পদ্ধতি	২০
২০।	জামাতকে এর অধিকার সম্পর্কে সচেতন না করার কুফল	২১
২১।	অজ্ঞদের প্রতি আশ্বাসবাণী	২২
২২।	আমীরদের বিশেষ দায়িত্ব	২২
২৩।	মতবিরোধ সম্পর্কিত ইসলামী নীতি	২৩
২৪।	অন্ধ সমর্থনের কুফল	২৪
২৫।	মজলিসে আলোচ্য বিষয় সুনির্ধারিত হতে হবে	২৪
২৬।	যার দায়িত্ব তাকে দিয়েই পালন করাতে হবে	২৫
২৭।	হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক কর্ম-কর্তাদের প্রতি নির্দেশাবলী	২৮

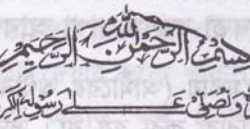

জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক ১৩ই সেপ্টেম্বর '৯১ নান্সপিট (Nunspeet), হল্যান্ডে প্রদত্ত

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (রাহেঃ) বলেনঃ গত তিনটি খুতবায় আমি এমন কিছু কষ্টদায়ক বিষয় উল্লেখ করেছি যা জামাতী নিযামের (জামাতের সংগঠনের) প্রতি যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন না করার কারণে সৃষ্টি হয়। তাকওয়ার অভাবে, জ্ঞানের অভাবে কিংবা সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির অভাবে ছোট ছোট ব্যাপার ফিতনার রূপ ধারণ করে এবং জামাতী নিযামের জন্যে একটি বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ্তাআলার এটি বিশেষ রহমত যে, এ জামাতে এ ধরনের ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠার পূর্বেই খিলাফতের পক্ষ থেকে সেটিকে মিটিয়ে দেয়া হয়। খিলাফতের নিযাম যদি না থাকতো তাহলে এ জামাত এ যাবৎ যে কত ভাগে বিভক্ত হয়ে যেত তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। কিন্তু ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠার আগে এর সম্ভাবনাগুলাকে দূরীভূত করাই প্রকৃত প্রজ্ঞার পরিচয়। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই আমি এ খুতবাগুলো ধারাবাহিক আকারে দিচ্ছি যেন জামাতের সদস্যগণ ভালভাবে জানতে পারেন যে, কোন্ কোন্ ধরনের ভুলত্রুটি কী কী পরিণাম বয়ে আনে আর তাঁরা যেন 'ফিতনাকে' এর সূচনা থেকেই চিনতে পারেন। রোগকে একবার চিনতে শিখলে আর সে সম্বন্ধে অবহিত হয়ে গেলে সেটিকে বাগে আনা কোন সমস্যাই নয়। প্রারম্ভিক অবস্থাতেই রোগ নির্ণয় করা জরুরী প্রয়োজন। যারা রোগ নির্ণয় করতে পারেন না বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগ তাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।

আজকের খুতবায় আমি দৈনন্দিন জীবনের ছোট খাট কয়েকটি বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরব যেগুলোর প্রতি সময়মত মনোযোগ না দিলে পরবর্তীতে কখনো কখনো এথেকে ভয়ঙ্কর ফলাফল বের হয়।

মজলিসে আমেলার মিটিং-এ ভদ্রতা ও শালীনতা বজায় রাখা আবশ্যক

সাধারণত মজলিসে আমেলায় (আমীরের অধীনস্থ হোক বা প্রেসিডেন্টের) সঠিকভাবে পরিবেশের তদারকি করা হয় না। ভদ্রতা ও শালীনতা বিবর্জিত কথাবার্তাও কখনো কখনো সহ্য করা হয়। অথচ এ ধরনের আচরণ থেকেই ফিতনার সূচনা হয়ে থাকে। যেসব মজলিসে আমেলায় পরস্পর ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও তাকওয়ার আলোকে কথা বলার অভ্যেস নেই সেগুলো ফিতনার উদ্ভব ও লালন ক্ষেত্র। দেখা যায় যে, মজলিসে আমেলার সদস্যদের মাঝে কয়েকজন একে অপরের সাথে বেশি সম্পর্ক রাখেন। আবার অন্য কয়েকজন একইভাবে নিজেদের মাঝে বেশি ঘনিষ্ঠতা রাখেন। এটির নাম দলাদলি নয়। প্রকৃতিগতভাবে এক ধরনের মানুষের সাথে কোন মানুষের বেশি মিল হয়। আরেক ধরনের মানুষ অন্য আরেক প্রকৃতির মানুষের সাথে বেশি উঠাবসা করে। মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের। তাই বিশেষ এক প্রকৃতির মানুষের সাথে কারও সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যাওয়া কোন আপত্তিজনক বিষয় নয়।

কেবল ঘনিষ্ঠজন ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে একে অপরকে সমর্থন করা পাপ বিশেষ

মজলিসে আমেলায় কেবল ঘনিষ্ঠতা ও প্রকৃতিগত নৈকট্যের কারণে একে অপরকে সমর্থন দেয়ার মানসিকতা ও মনোবৃত্তি একটি বিরাট ফিতনা বটে। এটি তাকওয়া বিরোধী আচরণ। এ বিষয়ে অজ্ঞতা ও বোকামীর কারণে অনেক ফিতনার উদ্ভব হয়। তারা মনে করেন, যেহেতু আমরা পরস্পর বেশি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রাখি তাই আমাদের একে অপরের কথাকে সমর্থন করা আবশ্যক। অথচ মজলিসে আমেলা হোক বা মজলিসে শূরা হোক, যে কোন ধরনের পরামর্শ সভাই হোক না কেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সেসব পরামর্শ-সভায় প্রত্যেক পরামর্শদাতাকে 'আমীন' বলে আখ্যা দিয়েছেন। 'আমীন' শব্দটি ব্যবহার করে তিনি এর মাঝে একটি বিরাট বিষয়-বস্তু সংরক্ষণ করে দিয়েছেন যা অনেকের দৃষ্টির অগোচরে রয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে 'আমীন' শব্দে একটি প্রকাশ্য শিক্ষা রয়েছে। যে বিষয়টি দৃষ্টির অগোচরে রয়ে যায় তা হচ্ছে এ 'আমীন' (অর্থাৎ প্রত্যেক পরামর্শদাতা) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ) কর্তৃক মনোনীত এবং তাঁদের আমানতের নিরাপত্তা বিধানকল্পে নিযুক্ত হয়েছেন। কখনো যদি পরামর্শ দেয়ার

সুযোগ হয় তবে পরামর্শদাতা যেন স্মরণ রাখেন, "আমি আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে 'আমীন' নিযুক্ত হয়েছি। সত্যতা এবং ন্যায়ের আমানত সংরক্ষণ করা আমার দায়িত্ব। এ বিষয়ে আমি খেয়ানত করতে পারব না।" সুতরাং যতই নিকটের মানুষ হোক না কেন, যতই সম্পর্ক গভীর হোক না কেন, পরামর্শদাতা নিজের অন্তরে যদি এটি বুঝতে পারেন যে, অমুকের কথা যুক্তিযুক্ত নয়, ন্যায়সম্মত নয়, এতদ্সত্ত্বেও তার কথা যদি সমর্থন করেন তাহলে এটি আমানতে খেয়ানত করার শামিল এবং এটি একটি বড় গুনাহর রূপ ধারণ করে। এটি এমন এক পাপ যাতে মানুষ প্রায়শই জড়িত হয়ে পড়ে। জামাতের বিভিন্ন কর্মকান্ডে, বিভিন্ন পরামর্শ সভায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ আমার হয়েছে। এ বিষয়ে আমার ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমি দেখেছি, ভাল ভাল নেক ও মুত্তাকী মানুষ যাঁরা নিষ্ঠার সাথে উৎসর্গকারী তাঁরাও না জেনে বা না বুঝে এ ধরনের গুনাহ্তে জড়িত হয়ে পড়েন। যেমন ঃ কোন একটি বিষয় পরামর্শের জন্য উত্থাপিত হয়েছে তখন একে অপরের চোখে চোখ রেখে সূক্ষ্ম একটি ইঙ্গিত প্রকাশ করা হয়, এছাড়া কোন একজন সদস্যের বোকামীর কারণে হেসে ফেলা কিংবা কারও ভুল পরামর্শ প্রদানের কারণে ইঙ্গিতে এটি বলা, 'দেখুন, এ ধরনের কথাই এর কাছে প্রকাশিত। সেই হালকা ও সূক্ষ্ম একটি মূকাভিনয় এমন একটি ভয়ানক কাজ যা তাদের ঈমানকে খেয়ে ফেলে, কমপক্ষে সে সময়ের জন্যে হলেও তাদের তাকওয়াকে বিনষ্ট করে।

তাকওয়ার আলোকে প্রত্যেক সদস্যের মতামত পেশ করার স্বাধীনতা আছে

যখন পরামর্শ গ্রহণের পালা চলে তখন কোন কোন সদস্য নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী বোকার মত কথাও বলে ফেলতে পারেন। কিন্তু যখন এ ধরনের কথার পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন সদস্য তাঁদেরকে ছোট করে দেখেন অর্থাৎ (মনে মনে) যেন একথা বলে, 'এ বোকা কি জানে? বরং বিষয়টি আমরা জানি' কিংবা এ কথা মনে করে, এ লোকটির এ ধরনের কথা বলাই সাজে'-একথা ভাবার বা এ মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে 'আমনাত' তাদের কাছ থেকে বিদায় নেয় এবং তারা খেয়ানতকারী হিসেবে সেই সভায় অংশ নেয়। মজলিসে আমেলা, মজলিসে শূরা বা অন্য যে কোন পরামর্শ সভায় প্রত্যেক সদস্যের জন্যে তাকওয়ার আলোকে কথা বলার সুযোগ পাওয়াটা তার অধিকার। কোন সদস্য তার কথাকে হেয় চোখে দেখার অধিকার রাখে না। তবে তার কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করার অধিকার অন্য সদস্যের রয়েছে আর এটি পাপ নয়।

অন্ধভাবে আমীরের মতামতের সমর্থন করার নাম আনুগত্য নয়

আরেকটি বিষয় যা আমি লক্ষ্য করেছি তা হ'ল এই, আমীরের প্রতি আনুগত্য ও সম্মানের একটি ভুল অর্থ করা হয়। সে ভুল অর্থটি হচ্ছে, প্রতিটি কথায় আমীরকে অবশ্যই সমর্থন করতে হবে। এ মানসিকতার কারণেও অনেক সময় মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় এবং দলাদলি আরম্ভ হয়ে যায়। আমাকে যেহেতু এ ধরনের অনেক বিষয়ের বিস্তারিতভাবে নিরীক্ষণ করতে হয়, তাই আমি যে-সব কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এগুলো বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ, কল্পনাপ্রসূত বিষয় নয়। একটি বিশেষ 'মজলিসে আমেলা'র কথা আমার মনে আছে যার এক অংশ আমীরের সব কথাকে অন্ধভাবে সমর্থন করাকে নিজেদের পেশা বানিয়ে নিয়েছিল। তারা এমনভাবে আমীরের সব কথার সমর্থন করে যেত যা দেখলে মনে হ'ত, একমাত্র তারাই আমীরের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং অন্যরা সবাই শত্রু।

খোদার দল, না আমীরের দল?

এ ধরনের আচরণের ফলে দু' প্রকার বিপদের আশঙ্কা থাকে। প্রথমত সমর্থকদের নিয়্যত যদি পরিষ্কারও হয় তবুও আমীর এটি মনে করতে পারেন যে, প্রকৃতপক্ষে এ সমর্থকরাই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আর অন্যেরা আমার শত্রু। দ্বিতীয়ত সমর্থকদের নিয়্যতও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোন কোন লোক তাদের এ ধরনের আচরণের মাধ্যমে সত্যি সত্যিই আমীরকে নিজেদের কুক্ষিগত করতে চায়। আর আমীর যদি সাদাসিদা স্বভাবের হন তাহলে তিনি তাদের হাতের খেলনাতে পরিণত হন। এর ফলে একটি ভয়ানক ফিতনার উদ্ভব হয়। অন্য অংশের লোকেরা যখন কথা বলে, সে সময়ে তাদের মনে একথার উদ্রেক হয় যেন এখানে দলাদলি আছে, আর আপাত দৃষ্টিতে আমীর নিজেই এ দলের তত্ত্বাবধায়ক। তিনি যেন একটি দলকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন। জার্মানীতে প্রদত্ত খুতবায় আমি উল্লেখ করেছিলাম, আমীর কোন বিশেষ দলের প্রতীক নয়। সে কেবল একটি দলেরই প্রতিনিধি এবং সেটি হচ্ছে খোদার দল। আমি তখন আমার সামনে উপস্থিত পরিস্থিতি ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই কথা বলেছিলাম। কোন কোন সময়ে এর বিপরীত ঘটাও সম্ভব। যখনই আমীর এসব মুসাহেবদের কথার কারণে তাকওয়ার আলোকে কথা না বলে তাদেরকে নিজের সঙ্গী বলে মনে করে এবং তাদের উপর কেবল এ কারণে নির্ভর করে কথা বলে

যে, তারা সব সময়ে তার সমর্থক, তখনই তারা তার (অর্থাৎ আমীরের) দলে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তার উচিত ছিল খোদার দলের প্রতিনিধি হওয়া যেন খিলাফত তার সমর্থন করে কিন্তু বাস্তবে তার এ আচরণের কারণে সে এ উচ্চমানের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। পরামর্শ চলাকালে এ আশঙ্কাসমূহ সম্বন্ধে কেবল আমীরকেই নয় বরং অন্যান্য সদস্যদেরকেও সতর্ক থাকতে হবে। যখনই একজন সদস্য কেবল বন্ধুত্বের কারণে কারও সমর্থন যোগায় তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্যে এ কথাটি উপলব্ধি করা মোটেও কঠিন কিছু নয়। মুত্তাকীর অন্তরে এমন চাটুকারীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি না বেড়ে বরং কমা উচিত। সময়মত তাকে সতর্ক ও সাবধান করে দিলে তারও সংশোধন সম্ভব হবে এবং সভার অন্যান্য সদস্যদের একথা ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হবে যে, এ সভার সভাপতি কোন দলের সদস্য নন, কেবল খোদার মানুষ, তিনি সত্যের সমর্থক এবং তিনি কোন দল এজন্যে কেবল সমর্থন করেন না যে, তারাও তাকে সমর্থন দিয়ে থাকে। তাই, সব বিষয়ে যদি তাকওয়াই আসল উদ্দেশ্য হয় তবে কোন ঝগড়ার আশঙ্কাই থাকে না।

তাকওয়া বিবেক-বুদ্ধিকে পূর্ণতা দান করে

একবার এক অমুসলমান আমাকে বুদ্ধি-বিবেক সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিল। সে জানতে চাইল, আমার কাছে বুদ্ধি-বিবেকের সংজ্ঞা কী? আমি তাকে বল্‌লাম, তুমি হয়ত বিষয়টি বুঝতে পারবে না, তবুও আমি তোমাকে বুঝাতে চেষ্টা করছি। তাক্‌ওয়ার চেয়ে বড় আর কোন বিবেক-বুদ্ধি হতেই পারে না। তাক্‌ওয়া এবং বিবেক প্রকৃতপক্ষে একটি জিনিসের দু'টি নাম। প্রত্যেকের নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেক রয়েছে। এর মাঝে সে নিজে নিজেই কোন বাড়তি বিষয় সংযোজন করতে পারে না। কিন্তু মানুষ যদি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তবে সে এমন এক জ্যোতির অধিকারী হয় যদ্বারা সে সবকিছু দেখতে আরম্ভ করে। আর একেই বিবেকের পূর্ণতা বলে। তখন সে কখনো কখনো নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সিদ্ধান্ত নেয়। এটি সে এজন্যে করে কেননা তখন সে দেখতে পায় যে, আমার ইচ্ছা এ মুহূর্তে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করছে, আমার বাসনা খোদার পরিকল্পনার বিরোধী। এসব সিদ্ধান্তে সেই মুত্তাকী নিজের ইচ্ছা ও বাসনার উপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও পরিকল্পনাকে প্রাধান্য দেয় যা সে নিজের প্রতিপালক সম্বন্ধে ধারণা করে। এটিই হচ্ছে তাকওয়া যার ফলশ্রুতিতে বিবেক-বুদ্ধি স্বচ্ছতা লাভ করে।

তাকওয়ার আলোকে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী কখনো দলাদলির শিকারে পরিণত হতেই পারে না। কখনো সে একজনের সমর্থন করবে আবার কখনো আরেকজনের। সমর্থনের উদ্দেশ্যে সমর্থন নয় বরং গ্রহণযোগ্য কথার কারণে এ সমর্থন। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) এমন প্রসঙ্গেই নসিহত করেছেন ঃ

"হিকমতের (প্রজ্ঞার) কথা প্রত্যেক মু'মিনের হারানো উট্‌নী। সে এর প্রকৃত মালিক। শত্রুর পক্ষ থেকে যদি পাওয়া যায় তথাপি সে এটিকে গ্রহণ করবে।"

ধরুন কারও মোটরগাড়ী চুরি হয়ে যাবার পর পাওয়া গেছে, কিন্তু সে বলল, যেহেতু আমার এ গাড়ী এক জঘন্য শত্রুর কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এজন্য আমি আমার গাড়ী নিব না। এমন কি কখনো হয়েছে? কক্ষনো না, বরং যত বেশি শত্রুতা তত তাড়াতাড়ি সে সেটিকে ফেরত নিতে চাইবে। দেখুন কি চমৎকার উদাহরণের মাধ্যমে হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) মু'মিন এবং হিকমতের সম্পর্ক বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ মু'মিন আর হিকমত একে অপর থেকে পৃথক হতেই পারে না।

পরামর্শ গ্রহণকালেও তাকওয়াকে প্রাধান্য দেয়া কর্তব্য

সুতরাং সাধারণত আমীরের সাথে একমত পোষণ করে না এমন কারও পক্ষ থেকে যদি হিকমতের কথা পাওয়া যায় তাহলে আমীরের উচিত, সে যেন সেটিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে। আর যারা ভুল পদ্ধতিতে তাঁকে সমর্থন করছে তাদেরকে যেন আমীর বুঝায় যে, তোমরা কেমন কথাবার্তা বলছো? এটি হচ্ছে গ্রহণযোগ্য ও কাজের কথা। এ পদক্ষেপের ফলে অগোচরে যদি কোন ফিতনা সৃষ্টির আশঙ্কাও হয়ে থাকে তা আল্লাহ্‌র ফযলে দূর হয়ে যাবে।

এছাড়া আরেকটি বিষয় জানা দরকার আর সেটি হচ্ছে জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা। জামাতে আহমদীয়ায় কিছু কিছু ফিতনা এ কারণে সৃষ্টি হয় যে, কোন কোন সদস্য জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনাকারীদের অর্থ খরচ করার পদ্ধতি সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হন না। এ খরচ আমীরের পক্ষ থেকেই হোক বা অন্যান্য সদস্যদের পক্ষ থেকেই হোক। খরচ কিভাবে করা উচিত, জামাতী নিযাম কাকে কি ধরনের অধিকার প্রদান করেছে- বেশির ভাগ সদস্য তা জানে না। এসব বিষয় যদি জানা থাকে তবে ফিতনা ছড়ানোর পরিবর্তে একটি ভুল পদক্ষেপের সংবাদ সঠিক সময়ে সঠিক ব্যক্তির কাছে পৌছাতে পারে।

নির্ধারিত সকল পদের উর্ধ্বে আমীরের পদ

মজলিসে আমেলার দু'টি পরিচয় রয়েছে। একটি মজলিসে আমেলা আমীরের অধীনস্থ। জামাতী নিযামে 'আমীর' এমন একটি পদ-মর্যাদা যা অন্যান্য সব নির্বাচিত পদের উর্ধ্বে। খলীফায়ে ওয়াক্ত বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গকে যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করে থাকেন সেসব পদের মাঝে 'আমীর' খলীফার পক্ষ থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা ও দায়িত্ব লাভ করে থাকেন। জামাতে বিভিন্ন পদ রয়েছে। সেক্রেটারী মালেরও কিছু ক্ষমতা রয়েছে, সেক্রেটারী তবলীগেরও রয়েছে, জামাতের প্রেসিডেন্টেরও আছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা আমীরকে দেয়া হয়েছে। কেননা আমীর সরাসরিভাবে খলীফায়ে ওয়াক্তের প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। তাঁকে পরামর্শের জন্যে তাঁকে নির্বাচিত করা হয়ে থাকে।

গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও জামাতী নির্বাচনের পার্থক্য

জামাতী নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক নির্বাচন এক জিনিস নয়। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জনগণের মতামত জানার উদ্দেশ্য পর্যন্ত জামাতী নির্বাচনও গণতান্ত্রিক। কিন্তু জনগণের জন্যে কোন্‌টি মঙ্গলজনক এ সিদ্ধান্ত কখনো জনগণের মতামতে নয় বরং খলীফায়ে ওয়াক্তের সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত হয়। খুব কমই এমন হয়, তবুও কখনো কখনো খলীফা দেখেন যে, কোন ব্যক্তি চালাকী করে কিংবা নিজের সমর্থকদের কারণে বেশি ভোট লাভ করেছে, এ ফলাফল অনুসারে যদি সিদ্ধান্ত দেয়া হয় তাহলে জামাতে চতুরতা, লোক-দেখানো ও দলাদলির প্রবণতা বেড়ে যাবে। যেহেতু খলীফায়ে ওয়াক্ত রসূলের মধ্যস্থতায় দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব করেন তাই তিনি এ দৃষ্টিভঙ্গীতে সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন। অন্যদিকে যেহেতু জামাতের সাথে যুগ-খলীফার সম্পর্ক কেবল আমীর বা প্রেসিডেন্টের মধ্যস্থতায় প্রতিষ্ঠিত হয় না বরং প্রত্যেক সদস্যের সাথে তাঁর একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে তাই জামাত তাঁর সিদ্ধান্তকে সব সময় প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং মোটেও এ আপত্তি তুলে না যে, কেন তাদের নির্বাচনী মতামত গ্রহণ করা হ'ল না। এটি দ্বিমুখী একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা কেবল আহমদীয়তেই বিদ্যমান। দুনিয়ার কোন গণতান্ত্রিক বা অন্য কোন ব্যবস্থাপনায় এ দ্বিমুখী নিরাপত্তা ব্যবস্থা পাওয়া যায় না। যা-ই হোক, খিলাফতের ব্যবস্থাপনাধীন প্রক্রিয়ায় আমীরকেই সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা প্রদান করা হয়ে থাকে। এর পরের স্তরের ক্ষমতা দেয়া হয় প্রেসিডেন্টদের। প্রেসিডেন্টদেরকেও প্রতিনিধিত্বের

ক্ষমতা দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু আমীরের তুলনায় কম। সেই ক্ষমতাগুলো কী কী? কোথায় কোথায় তফাৎ রয়েছে? মজলিসে আমেলার সাথে এঁদের সম্পর্ক কী?---- এসব কথা জামাতের সামনে পরিষ্কারভাবে ও বিস্তারিত আকারে তুলে ধরা উচিত। কেননা এখন আহমদীয়া জামাত বিশ্বের ১২৬টি (বর্তমানে ১৮২-প্রকাশক) দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দৃষ্টির আড়ালে সেসব দেশে কোন কোন স্থানে মতবিরোধ ফিতনার রূপ ধারণ করতে পারে। যেহেতু যুগ-খলীফার খুতবাগুলো অতি সত্বর দুনিয়ার সব দেশে প্রেরণ করা সম্ভব হয়ে গেছে তাই এটিই একমাত্র মাধ্যম যদ্বারা আমরা পুরো জামাতকে নিযাম সম্বন্ধে অবহিত করতে পারি এবং আস্তে আস্তে তাদের অন্তরে এ নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত করতে পারি। যা-ই হোক, এ নিযাম প্রসঙ্গেই আমি জানাতে চাই যে, মজলিসে আমেলা এবং আমীরের ক্ষমতার মাঝে কতটুকু তফাৎ রয়েছে আর এতদুভয়ের পরস্পর সম্পর্কই বা কী? যেখানে সুযোগ হবে এ প্রসঙ্গ ছাড়াও অন্য এমন কিছু প্রসঙ্গে আলোকপাত করব, যেগুলোর কারণে ফিতনা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

আমীরের প্রশাসনিক ক্ষমতা

জামাতের দৈনন্দিন যাবতীয় কার্যনির্বাহের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমীরের আছে। এবং এগুলো প্রশাসনিক ক্ষমতা। মজলিসে আমেলার সার্বিকভাবে মজলিসে আমেলা হিসেবে কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই। এ প্রশাসনিক ক্ষমতা হয় আমীরের থাকে নয় মজলিসে আমেলার সেক্রেটারীদের থাকে যারা নিজ নিজ বিভাগের ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা রাখেন। মজলিসে আমেলার একটি পরিচয় হ'ল, এটি এসব পদপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সমন্বয় বিশেষ। কিন্তু সমন্বিত আকারে মজলিসে আমেলা কার্যনির্বাহক নয়; বরং উপদেষ্টা পরিষদ। আপোষে বসে সলা-পরামর্শ ও চিন্তা-ভাবনা করার একটি মজলিস বিশেষ।

আর্থিক বিষয়ে মজলিসে আমেলার ক্ষমতা

কোন কোন বিষয়ে মজলিসে আমেলা এমন ক্ষমতা রাখে যা আমীরের নেই। যেমন ঃ আর্থিক বিষয়ে। মজলিসে আমেলার অনুমোদন ছাড়া আমীর নিজে নিজেই মজলিসের বা জামাতের সামনে কোন বাজেট উপস্থাপন করতে পারেন না। আর্থিক বাজেটের খুঁটি-নাটি পরীক্ষা করে দেখা এবং সমস্ত দিক বিবেচনা

করে শূরাতে পেশ করার জন্যে একটি বাজেট প্রণয়ন করা মজলিসে আমেলার কাজ। আমীর নিজে থেকে এককভাবে এ বাজেট বানাতে পারেন না। এ স্থলে এসে আর্থিক বিষয়ে আমীরের ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। এর পরের স্তর হচ্ছে এই, মজলিসে আমেলার অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রস্তাবিত বাজেট যখন জাতীয় মজলিসে শূরায় অনুমোদন লাভ করে তখনও সেটি চূড়ান্ত হয় না। বাজেট চূড়ান্ত করার আগে মরকয (কেন্দ্র) থেকে অনুমোদন লাভ করা আবশ্যক। মজলিসে শূরার কোন সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে ততক্ষণ পর্যন্ত রূপ লাভ করে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেটি জামাতী মরকযের (কেন্দ্র) অনুমোদন লাভ করে। যখন কেন্দ্রীয় অনুমোদন প্রদান করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবেই সে বিষয়ে আমীরের ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে যায়। কেননা আমীর তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সিদ্ধান্তসমূহকে পরিবর্তন করতে পারেন না। মজলিসে শূরার যে-সব সিদ্ধান্ত যুগ-খলীফা কর্তৃক বা ওয়াকীলে আ'লা কর্তৃক অনুমোদিত সে-সব বিষয়ে আমীর নিজে দায়িত্ব পালনে বাধ্য। তাই আমীর সম্বন্ধে এরূপ ধারণা করা যে, তিনি স্বেচ্ছাচারিতার ক্ষমতা রাখেন, একদম ভুল এবং বাজে ধারণা। যখন আমীর কেন্দ্রীয় অনুমোদনপ্রাপ্ত শূরার সিদ্ধান্তসমূহের এবং বাজেটের অধীনস্থ হয়ে যান তখন কোন ক্রমেই অনুমোদিত বাজেটের বাইরে তাঁর খরচ করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক স্থানে এ ধরনের ভুল হয়ে থাকে এবং হচ্ছেও।

জামাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সুরক্ষিত করা আবশ্যক

জামাতে বাজেট অনুসরণ করার অভ্যেস গড়ে তোলা আবশ্যক। কেননা আল্লাহ্‌র ফযলে পৃথিবীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা হচ্ছে আহমদীয়া জামাতের মালী-নিযাম। একটি ঘোষণার ফলশ্রুতিতে জামাতের সদস্যরা যে লাখ-লাখ কোটি কোটি টাকার কুরবানী পেশ করে থাকেন এর একটি কারণ হচ্ছে তাদের আন্তরিকতা। একই সাথে আরেকটি কারণ হ'ল, তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, তাদের দেয়া প্রতিটি পয়সা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিযুক্ত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের হাতে সোপর্দ করা হচ্ছে। তাদের মাঝে কোন অসৎ প্রবণতা নেই। আর জামাতের সদস্যদের এ মানসিকতা ও দৃঢ় -বিশ্বাসকে সংরক্ষণ করা একান্ত জরুরী বিষয়। তাই আর্থিক বিষয়ে আমীরকে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় কম ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কেননা আমীরের নিজ সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে এসব বিষয়ে জড়িত না হওয়া তাঁর পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কিন্তু কখনো কখনো বেশি বেশি সম্মান পাওয়ার কারণে,

জামাতে বার বার আমীর সম্বন্ধে একথা বুঝানোর কারণে যে, ইনি খলীফার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁর কেবল আনুগত্যই আবশ্যক নয় বরং তাঁকে সম্মান করাও কর্তব্য, তাঁর সাথে ভক্তি ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোল- এসব কথার কারণে অনেক সাদাসিদা মানুষ মনে করেন যে, আমীর কোন ক্ষেত্রে যদি জামাতী নিযামও লংঘন করে বসেন বা এমন সব ক্ষমতা প্রয়োগ করেন যা তাঁকে দেয়াই হয় নি সেক্ষেত্রে নীরবতা পালনই আমীরকে সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর আনুগত্য প্রদর্শনের বহির্প্রকাশ। এ মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ ভুল এবং এটি একটি বাজে কথা। বিবেক-বুদ্ধি ও তাকওয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

আনুগত্যের প্রকৃত মর্ম

তাকওয়া আমাদেরকে একথা শিখায় যে, উর্ধ্বতন সত্তার আনুগত্যের উদ্দেশ্যে তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তার আনুগত্য করা হয়। তাকওয়ার প্রথম পাঠ কুরআন শরীফ আমাদেরকে এভাবে পড়িয়েছে ঃ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের খাতিরে সমস্ত সৃষ্টিকে আদমের সামনে নত হতে হবে। আর যখন শয়তান বলেছিল, 'আমি আদমের চাইতে উত্তম' তখন সে এ মৌলিক সত্যকে উপেক্ষা করেছিল- আনুগত্য কেবল আল্লাহ্‌র করা হয়, এবং খোদার আনুগত্যের অধীনে যাকে কর্তৃপক্ষ বানানো হয় তাঁর আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য এবং তাঁকে অস্বীকার করার নাম বিদ্রোহ। সুতরাং উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আনুগত্য এসব বিষয়ে মীমাংসার সবচেয়ে উত্তম পন্থা। এ পদ্ধতিতেই পথ-নির্দেশনা লাভ করা উচিত। কোন ক্ষেত্রে যদি আমীর তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বিদ্রোহসূলভ আচরণ করে কিংবা তাঁর আনুগত্যকে উপেক্ষা করে সে ক্ষেত্রে জামাতও তাঁর আনুগত্য-মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা জামাতের বিশ্বস্ততা আমীরের সাথে নয় বরং আমীরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে। তার বিশ্বস্ততা খলীফার সাথেও নয় বরং খলীফার চেয়ে বড় কর্তৃপক্ষ নবীর সাথে এবং আল্লাহ্‌র সাথে। এ আঙ্গিকে লক্ষ্য করলে কোন কর্মকর্তাই স্বেচ্ছাচারী হ'তে পারেন না এবং সবার আনুগত্য কেবল আল্লাহ্‌র খাতিরেই করা হয়। তাই বয়াতের শর্তে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আমি পুণ্য কর্মে আপনার আনুগত্য করব।' খলীফাতুল মসীহ্‌র হাতে এ শর্তে বয়াত করা হয় না, 'আমি সব বিষয়েই আপনার আনুগত্য করব' বরং ওয়াদা করা হয়, 'যে নেকী ও পুণ্যের কাজ আপনি আমাকে করতে বলবেন সেগুলোতে আমি আপনার আনুগত্য করব। যেসব মা'রুফ (শরীয়তসম্মত) সিদ্ধান্ত আপনি প্রদান করবেন সেগুলোতে আপনার

আনুগত্য করব।' নেক কাজ ও মা'রুফ সিদ্ধান্ত বলতে একথা বুঝানো হয়েছে যে, শরীয়তের সীমায় যে-সব আদেশ রয়েছে সেগুলোর বিষয়ে আমি আপনার আজ্ঞা পালন করব। এর বাইরে কোন ধরনের আনুগত্যের প্রশ্নই উঠে না। কেননা সেটি হবে শয়তানী আনুগত্য। সুতরাং আমীরের আনুগত্যের বিষয়টিও এ একই প্রক্রিয়ার অধীন। কোন আমীর তাঁর আর্থিক ক্ষমতাকে যদি উপেক্ষা করে এবং অর্থ ব্যবহারের বিষয়ে সীমা অতিক্রম করে চলে তবে মজলিসে আমেলার জন্যে অবশ্য-কর্তব্য হবে এটা যেন তৎক্ষণাৎ খলীফায়ে ওয়াক্তকে কিংবা উর্ধ্বতন অর্থ বিষয়ক কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাত করে।

এ প্রসঙ্গেও পরিষ্কার নিয়ম-কানুন রয়েছে যে, কোন্ কোন্ বিষয়ে তাৎক্ষণিক সহযোগিতা প্রদান করবে আর কোন্ কোন্ বিষয়ে করবে না।

টাকা উঠানোর বিষয়ে নতুন নির্দেশনা

হিসাব (Account) থেকে টাকা উঠানোর জন্যে আমীরের সাথে সেক্রেটারী মালের স্বাক্ষরও আবশ্যক। কোন কোন ক্ষেত্রে এছাড়াও আরও দু'জন কর্মকর্তা স্বাক্ষর দানকারী হিসাবে রাখা হয়। সারা পৃথিবীতে এ নিয়মটি প্রচলিত রয়েছে যেন জামাতের অর্থ-ভাণ্ডারের উপর কেউ এককভাবে জেঁকে বসতে না পারে আর যখন খুশী যা খুশী বের করে নিতে না পারে। বরং নিয়ম করা হয়েছে যে, তার মর্যাদা ও মাকাম যত বড়ই হোক না কেন তার সঙ্গে আরেকজনকে স্বাক্ষর করতেই হবে। প্রত্যেক সেই ক্ষেত্রে যখন কেন্দ্রীয় নির্দেশনার বিরুদ্ধে টাকা উঠানো হয় তখন স্বাক্ষরকারী সঙ্গীও এ কাজে দায়ী হয়ে যায়। কেননা তাকে আমীন (অর্থাৎ বিশ্বাসভাজন) নিয়োগ করা হয়েছে এবং তার স্বাক্ষর এজন্যে আবশ্যক রাখা হয়েছে যেন কি হচ্ছে তিনি খোঁজ-খবর রাখেন এবং যদি নিয়ম-নীতি বিরোধী কোন কাজ হয় তিনি যেন বাধা প্রদান করেন।

এ প্রসঙ্গে এখন পর্যন্ত আমার নির্দেশনা এই ছিল যে, স্বাক্ষরকারী সেক্রেটারী মাল বা অন্য দু'জন যদি আমীরকে স্পষ্টভাবে নিয়ম-বিরোধী কাজে টাকা উঠাতে দেখে তাহলে স্বাক্ষর করার আগে যেন অবশ্যই আপত্তি উত্থাপন করে। এর পরেও যদি আমীর স্বাক্ষর করার আদেশ দেন তবে যেন স্বাক্ষর প্রদান করা হয়। কিন্তু আমি মনে করি এ বিষয়ে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এমন পরিস্থিতিতে এখন থেকে যারা স্বাক্ষরকারী আছেন তারা প্রথমে আপত্তি জানিয়ে বলবেন, 'আমরা মনে করি যে, এটি জামাতী নিযামের প্রকাশ্য লংঘন তাই আমরা

স্বাক্ষর দান করব না। আপনি উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে আমাদের সম্বন্ধে নালিশ করুন। আর আমরাও এ বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্যে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে জানাচ্ছি।' এ পন্থায় অতি সত্বর এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। বর্তমানে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ এত সহজ হয়ে গেছে যে, দুনিয়ার যে কোন প্রান্ত থেকে অনতিবিলম্বে যোগাযোগ সম্ভব। আর এ ধরনের সমস্যা অতি ব্যতিক্রমী এবং কালে-ভদ্রেই কখনও ঘটে থাকে। তাই এজন্যে বড় ধরনের অশান্তি হবার কোন কারণ নেই।কিন্তু অস্বীকার করার সময় আমীরের মর্যাদা ও সম্মানের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। যাকে আমীরের সাথে স্বাক্ষর করার দায়িত্ব দেয়া হয় এমন ব্যক্তি যদি স্বাক্ষর প্রদানে অস্বীকৃতি জানান তবে তিনি নিঃসন্দেহে একটি বিরাট দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে উত্তোলন করেন। কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তিনি স্বাক্ষর প্রদানে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন না। তিনি যদি কোন স্থলে নিযামের পরিষ্কার লংঘন প্রত্যক্ষ করে স্বাক্ষরে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন তবে তাকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতেই হবে। তার দৃঢ়বিশ্বাস থাকতে হবে, আমার এ অস্বীকৃতি সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত।

বাজেটভুক্ত বিভিন্ন খাতের তদারকি

এ বিষয়ে আরও কিছু এমন দিক রয়েছে যেগুলো উপেক্ষিত হচ্ছে। যেমন ধরুন, সফর-খাতে জামাতী বাজেট নির্ধারিত হয়েছে, আবার অতিথি-আপ্যায়নেরও খাত নির্ধারিত আকারে বরাদ্দ করা হয়েছে। একইভাবে আরেকটি খাতে বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো থেকে আমীর নিজে কিংবা আমীরের অধীনস্থ ব্যবস্থাপকগণও খরচ করবেন। প্রত্যেক ব্যবস্থাপক নিজের কার্যভার বহন করার সময় কিছু না কিছু খরচ করেই থাকেন। কিন্তু তাদের কেউ তাদের জন্যে বরাদ্দকৃত অর্থের বেশি খরচ করার অধিকার রাখেন না। কিন্তু হয় এমন যে, ধরুন সফর খরচের খাতে যদি অনেক বেশি খরচ হয় তখন অন্য খাতের টাকা থেকে সফর খরচ বাবদ খরচ করা হয়। এ বিষয়টি অন্যদের (একাধিক ব্যক্তির) দৃষ্টিতে ধরা না পড়ে পারেই না। যে বাজেট থেকে খরচ হয় তা মুহাসেব (একাউন্টেন্ট) দেখেন, জামাতের অডিটরও তা দেখেন। এসব নিযাম এজন্যেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেন তারা সময়মত কেন্দ্রকে অবহিত করেন যে, কোন্ কোন্ খরচ তাদের খাত ও স্থানের দিক থেকে সঠিকভাবে করা হয়েছে আর কোন্গুলো করা হয় নি। কখনো কখনো আমি যখন তদন্ত করাই তখন রিপোর্ট পাই যে, সবকিছু ঠিক

আছে কোনরূপ ভুলভ্রান্তি নেই। কিন্তু যেহেতু আমার মনে এক ধরনের ধাক্কা লেগে যায় আর আমার মন বলে যে, পরিস্থিতি সঠিক নয় সেহেতু আমি বিস্তারিত হিসাব চেয়ে পাঠাই। কখনো কখনো আমীরদেরকে বলি, আপনারা আপনাদের অমুক অমুক খাতের সমস্ত বিল প্রেরণ করুন। এ কাজে আমার অনেক সময় ব্যয় হবে ঠিকই কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি আর্থিক বিষয়ে নিশ্চিত হই আমি আপনাদেরকে যে আর অনুমতি প্রদান করতে পারি না। যখন বিল দেখি তখন ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায়। সফর খরচ বাবদ যদি এক লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়ে থাকে আর সে স্থলে পাঁচ লাখ টাকা খরচ হয়ে যায়; কিন্তু এ বাড়তি চার লাখ টাকা 'সফর খরচ' খাত থেকে খরচ করা হয় নি বরং কিছু টাকা অমুক খাত, কিছু টাকা অন্য এক খাত আর বাকী টাকা আরেক খাত থেকে খরচ করা হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে। এটি একটি অবৈধ কাজ। যখন প্রশ্ন করা হয় তখন উত্তর দেয়া হয় যে, দেখুন মোট বাজেটে তো অনেক সুযোগ ছিলই তাই সেখান থেকে আমরা খরচ করে ফেলেছি। এ ব্যাপারে দু'টি কথা খুব ভালভাবে জামাতকে বুঝে নেয়া উচিত। মজলিসে আমেলা বাজেটের গন্ডী থেকে এক খাতের টাকা অন্য খাতে বরাদ্দ করার ক্ষমতা রাখে, কোন একক কর্মকর্তা এ ক্ষমতা রাখেন না। কিন্তু কেন্দ্রকে না জানিয়ে এক খাতের খরচ অন্য খাতে চাপিয়ে দেয়ার ক্ষমতা মজলিসে আমেলারও নেই। এটিই অসততা আর এর ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে অনেক ফিতনার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। সফর-খরচের খাত যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তবে সফর খরচের খাতকে বাড়ানো উচিত। কিন্তু কোনক্রমেই সফর খরচের বিল অন্য খাতে যাবে না। বাস্তবে এ ধরনের কাজই অগোচরে হয়ে যায়। মজলিসে আমেলা বসে সফর খরচের খাতকে এক লাখের স্থলে পাঁচ লাখ না করে এবং অমুক অমুক খাত থেকে কেটে বাড়তি চার লাখ সফর-খরচ খাতে সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত না নিয়ে, সফর খরচের খাত এক লাখের জায়গায় এক লাখই থাকে আর সফর-খরচের বিল অন্য খাতে খরচ হিসেবে দেখানো হয়। সফর-খরচ খাতের কথা আমি কেবল উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরছি। অন্যান্য খাতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে থাকে। হঠাৎ একদিন আমীর সাহেব এবং তাঁর অন্যান্য সঙ্গীরা হিসাবে মিলাতে বসে যান আর বলেন যে, অমুক খাতে বেশি খরচ হয়ে গেছে এটিকে ঠিক করার পন্থা কি? তখন বলা হয় যে, এ খরচটিকে অমুক অমুক খাতে ভাগ করে দাও। এটি সম্পূর্ণরূপে বদ দেয়ানতি (অবিশ্বস্ততা)। বদ দেয়ানতি বলতে এখানে এটি বুঝায় না যে, কেউ টাকা নিজের পকেটে ভরেছে বরং এ ক্ষেত্রে অবিশ্বস্ততার অর্থ হচ্ছে আমানতের খেয়ানত। জামাতের নিযাম কয়েকটি

নিয়ম-নীতির অনুসরণে টাকা খরচ করার অনুমতি দিয়েছে সেগুলোকে উপেক্ষা করা হচ্ছে, অন্যদিকে কেন্দ্রকে এ বলে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে যে, আপনাদের নির্দেশনার আলোকে খরচ করা হচ্ছে। তাই মজলিসে আমেলার প্রত্যেক সদস্যকে এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে যেন সার্বিকরূপে মজলিসে আমেলার যেসব ক্ষমতা রয়েছে সেগুলোর উপর কেউ যেন হস্তক্ষেপ করতে না পারে। কেউ যেন এসব ক্ষমতাকে অবৈধভাবে নিজের কব্জায় নিয়ে না ফেলে।

মূল বাজেট পরিবর্দ্ধন করার ক্ষমতা মজলিসে আমেলার নেই

একটি ক্ষমতা স্বয়ং মজলিসে আমেলারও নেই। আর সেটি হচ্ছে সম্পূর্ণ বাজেটের মোট অঙ্ককে নিজের থেকে তারা বাড়াতে পারেন না। যেমন ধরুন, সম্পূর্ণ বাজেট হচ্ছে ১০ লাখ টাকার। এরই মাঝে বিভিন্ন খাতের কোনটাতে ১০ হাজার কোনটাতে ৫০ হাজার টাকার খাত বরাদ্দ করা আছে। বাজেটের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন মজলিসে আমেলার পক্ষ থেকে করা সম্ভব। তবে এককভাবে নয়। কিন্তু ১০ লাখ টাকাকে ১১ লাখ টাকায় উন্নীত করার ক্ষমতা মজলিসে আমেলাও রাখে না। এর জন্যে অবশ্যই কেন্দ্রকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, আমরা বছর চলাকালীন সময়ে মূল বাজেট বাড়াতে পারি কি না। এ ব্যাপারেও কখনো কখনো কেন্দ্রের অনুমতি ছাড়াই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

চলতি বাজেটভুক্ত বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করার ক্ষমতা মজলিসে আমেলা রাখে

আরেকটি বিষয় বার বার বুঝানো হয়েছে। ধরুন, কোন খাতে বরাদ্দকৃত টাকা নিঃশেষ হতে চলেছে অথচ এ খাতে আরও প্রয়োজন। টাকা শেষ হয়ে যাবার এবং পরবর্তীতে প্রয়োজন অনুভব করার আগেই আপনারা মজলিসে আমেলার মিটিং ডাকুন। সেই মিটিং-এ উক্ত খাতে টাকা বৃদ্ধির অনুমোদন নিয়ে নিবেন। এটি না করার কারণে দেখা যায় যে, যখন বছর শেষে আমরা হিসাব চেয়ে পাঠাই তখন আবেদনের পর আবেদন আসতে থাকে যে, বাজেটের অমুক খাতে এত বেশি প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, অমুক খাতেও টান পড়েছিল তাই অমুক খাতে এত এবং অমুক খাতে এত টাকার অনুমোদন প্রদান করুন। অতীতে

কখনো কখনো এসব ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করতে হয়েছে। কেননা জামাতে এখনও পুরোপুরি তরবিয়তের অভাব রয়েছে। এখন এ খুতবার মাধ্যমে আমি পরিষ্কারভাবে একথা বলে দিচ্ছি, অনেকবার আমি এসব ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করেছি কিন্তু আগামীতে এগুলো আর ক্ষমা হবে না। কেননা জামাতের নিযামে আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংরক্ষণ অত্যন্ত বেশি দরকার। আগামী শত শত বছরের সাথে এ বিষয়টি জড়িত। আহমদীয়া জামাত আল্লাহ্‌র ফযলে যেভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে কুরবানী পেশ করে থাকে, এটি সত্যিই তুলনাহীন। পৃথিবীর অন্য কোন ব্যবস্থাপনায় বা জাতিতে এর একভাগও কুরবানী দেখা যায় না। তাই এ পবিত্র নিযামের নিরাপত্তা বিধান ও সংরক্ষণ আবশ্যক। আর আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংরক্ষণের প্রশ্নে খরচ-পদ্ধতির সংরক্ষণও অত্যন্ত জরুরী। জামাত খরচ তদারকির বিষয়ে যদি সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকে এবং ঘূর্ণাক্ষরেও কোথাও নিয়ম-নীতি বিরোধী কাজ না হয় তাহলে আল্লাহ্‌র ফযলে জামাতকে আল্লাহ্ এক বড় সৎসাহস প্রদান করেছেন এবং ধর্মের জন্যে খরচ করার এমন মজা পাইয়ে দিয়েছেন যে, ইনশাল্লাহ্ আগামীতে জামাতের ভান্ডার কখনো ফুরোবে না। বর্তমানে যেভাবে প্রত্যেকটি চাহিদা পূর্ণ হচ্ছে আগামীতেও অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিন্তু যেখানে আমাদের নিয়্যত রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে সেখানে এ বরকত ও আশীষগুলোও নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই আর্থিক ব্যাপারে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয়েও আইনকে নিজের হাতে তুলে নেয়া পাপ জ্ঞান করা উচিত। বিশ্বস্ততার অর্থ কেবল এটুকুই নয় যে, এ টাকা ধর্ম সেবার জন্যে তাই ধর্মবিষয়েই খরচ কর। আর বিশ্বস্ততা বলতে একথাও বুঝায়, 'যে কাজের অধিকার তোমাকে দেয়া হয়েছে কেবল সেটুকুই কর, যে কাজ করার অধিকার তোমার নেই সে কাজ করো না।' এ পর্যায়ে যদি আমরা আমাদের বিশস্ততার সংরক্ষণ করি তবে ব্যক্তিগত খরচের প্রশ্নই উঠে না। এমন বদদেয়ানতি যা শেষ পর্যায়ে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে ধর্মের সম্পদ ব্যয় করার রূপ ধারণ করে, এর সূচনা এ ধরনের ছোট খাটো বদদেয়ানতি থেকেই হয়। একবার একস্থলে অসাবধানতা দেখানো হয়, পুনরায় দ্বিতীয়বার অসাবধানতা দেখানো হয়, ফলশ্রুতিতে এ অসাবধানতা সাহস বাড়িয়ে দেয়, লজ্জাবোধ কমিয়ে দেয়, এরপর জামাতের খরচ ব্যক্তিগত স্বার্থেও আরম্ভ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র ফযলে এ ধরনের দুর্ঘটনা আহমদীয়া জামাতে অত্যন্ত ব্যতিক্রমী এবং কালে-ভদ্রে কখনো ঘটেছে। আর যেখাইে ঘটেছে সেখানেই জামাতের টাকা ফেরত দেয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলো অনেক দূরের কথা।

উপরোক্ত বক্তব্যের সারাংশ

আমি আপনাদেরকে দৈনন্দিন বিষয়াদি দিয়ে জামাতী নিযাম বুঝাচ্ছি। সেগুলো হচ্ছে, বাজেটের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধন করার ক্ষমতা মজলিসে আমেলা রাখে। এরপর সে বিষয়ে অনুমোদন নেয়া এর কাজ। মূল বাজেট পরিবর্দ্ধন করার কোন অধিকার এর নেই। কেন্দ্রের কাছে আবেদন করা যেতে পারে। বাজেট থেকে খরচ করা আমীরের দায়িত্ব। যে স্থলে আমীর সীমালংঘন করে সে স্থলে স্বাক্ষরকারীকে স্বাক্ষরদানে বিরত থাকতে হবে। এখন থেকে স্বাক্ষরদানকারী প্রত্যেকের এটি দায়িত্ব যে, এমন পরিস্থিতিতে তিনি যেন আমীরকে বলেন, আপনি আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা লংঘন করেছেন। তাই আমি এ অবাধ্যতায় আপনার শরীক হতে পারব না। প্রথমে কেন্দ্রের অনুমতি নিন, এরপর আমাকে জানান তাহলে আমি স্বাক্ষর করবো। এখন থেকে যদি এসব বিষয়ে কঠোরতার সাথে আমল করা হয় তবে যে সামান্য একটি মনোবৃত্তি সৃষ্টি হতে দেখা যাচ্ছে তা আগামীতে চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

আমীরের বিশেষ ক্ষমতা এবং প্রয়োগের পদ্ধতি

মজলিসে আমেলা ও আমীরের পরস্পর সম্পর্কের বিষয়ে একথা মনে রাখা উচিত যে, আমীর কখনো কখনো মজলিসে আমেলার সিদ্ধান্তকে নাকচ করার ক্ষমতা রাখেন। এ ক্ষমতা তিনি তখন প্রয়োগ করেন যখন তিনি মনে করেন যে, মজলিসের এ সিদ্ধান্ত জামাতের বৃহত্তর স্বার্থের বিরোধী এবং জামাতের জন্যে কোন কোন বিপদের উদ্ভব ঘটাতে পারে। সে পর্যায়ে আমীর VETO (ভেটো) প্রয়োগ করার অধিকার রাখেন। কিন্তু আমীরের এটি আবশ্যক দায়িত্ব তিনি যেন উক্ত ঘটনার পনর দিনের মধ্যে কেন্দ্রকে VETO প্রয়োগের কারণ দর্শান। এমনও দেখা গেছে যে, আমীর VETO প্রয়োগ করেছেন এবং অনেকবার করেছেন কিন্তু কখনো কেন্দ্রকে অবহিত করেন নি। অন্যদিকে তিনি জামাতকেও জানান নি যে, জামাত কী কী অধিকার রাখে। অর্থাৎ যদি আমীর তাঁর VETO প্রয়োগ ক্ষমতা ব্যবহার করেন তবে এ বিষয়ে জামাত কী কী অধিকার রাখে আর এর কী করণীয়?

জামাতকে এর অধিকার সম্পর্কে সচেতন না করার কুফল

এ প্রসঙ্গে জামাতকে তরবিয়ত না দেয়ার কারণে অতীতে জামাতে বড় বড় ফিৎনা দেখা দিয়েছে। বিশেষভাবে এর কারণে আফ্রিকায় জামাত ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগে কেন্দ্র থেকে তরবিয়ত প্রাপ্ত অর্থাৎ আইন কানুন সম্বন্ধে জ্ঞাত কোন ব্যক্তিকে সেখানে আমীর নিযুক্ত করা হ'ত। আহমদীয়তে নতুন নতুন প্রবেশকারীরা নিষ্ঠাবান ছিলেন ঠিকই কিন্তু জামাতী নিযাম সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন। তাদেরকে আমীর সাহেব তাদের অধিকার সম্বন্ধে অবহিত করেন নি বরং তাদেরকে নিজের অধিকার সম্বন্ধে জানিয়েছেন। যখনই তারা আমীরের কোন সিদ্ধান্তের বিষয়ে আপত্তি করেছেন তখন হয় তাদেরকে কঠোরভাবে এই বলে দাবানো হয়েছে, 'তোমরা আমীরের বিরুদ্ধে কথা বলার কে?' নয় তাদের বিরুদ্ধে আমীর কেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠানো আরম্ভ করেন, 'অমুক ব্যক্তি অমুক অমুক সময়ে এমন এমন কথা বলেছে, যদিও এখনকার মত সে শান্ত আছে কিন্তু তার মাঝে ফিতনার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।' এর কারণে জামাতের অনেক ভাল ভাল কর্মী সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েন। কিন্তু কখনো তাদেরকে একথা বুঝানো হয় নি, 'যদিও আমি তোমাদের সিদ্ধান্তে VETO প্রদান করার অধিকার রাখি, তথাপি তোমরাও এবং তোমাদের প্রত্যেকে আমার আপত্তিকর সিদ্ধান্তের বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে যুগ-খলীফার কাছে পত্র লেখার অধিকার রাখো। এ নালিশ প্রেরণের পন্থা হচ্ছে এই, সরাসরি হুযূরকে যদি চিঠি দাও তাহলে আমাকে এর একটি নকল দিও। কিন্তু এর চেয়ে উত্তম পন্থা হচ্ছে এই, যার বিরুদ্ধে নালিশ তার মাধ্যমেই চিঠি প্রেরণ করা এবং একটি নকল সরাসরি কেন্দ্রে পাঠাও যেন এ ভ্রান্তি না থাকে যে, জামাতের অমুক কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে প্রেরিত নালিশ লুকোচ্ছে।' একথা যদি বলা হ'ত তাহলে যে-সব ফিতনার আমি উল্লেখ করছি সেগুলোর একটিরও উদ্ভব হ'ত না। এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত জামাতের নতুন সদস্যদের এ ধোঁকার মাঝে রাখা হয় যে, আমারাতের নিযামে সব কিছুর একচ্ছত্র মালিককে 'আমীর' বলা হয়। আমীরের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি যদি সৃষ্টি হয় তবে সেটি সমাধানের জন্যে ধৈর্য ধারণ করা ছাড়া আর কোন পন্থাই নেই। সবাই ধৈর্য দেখাতে পারে না। এমন ব্যক্তিরা কোন পথ না পেয়ে শেষে নিজেরাই নতুন রাস্তা উদ্ভাবন করে। তখন তারা নিজেদের আওতাভুক্ত সমাজে নিজ বন্ধুদের মন খারাপ করার চেষ্টা করে এবং এভাবে ধীরে ধীরে জামাতের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা কমে আসে। এক ধরনের হতাশা ছেয়ে যায়। আর যখন এ বিষয়টি অনেক দূর এগোয় তখন হঠাৎ ফিতনার জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়ে। কোন কোন দেশে ভীষণ ক্ষতি হয়েছে এসব

কারণে। ২০/২৫ বছর আগে সেসব দেশে যদি এ ধরনের ক্ষতি সাধিত না হ'ত তবে আমার মতে জামাত আজকের তুলনায় দশগুণ বেশি শক্তিশালী হ'ত। বড় বড় প্রভাবশালী নিষ্ঠাবান লোকেরা নিযামের বাইরে চলে যান। তাদের নিষ্ঠার প্রমাণ হচ্ছে এই, সেই ফিতনার পর এবং তাদের পৃথক হয়ে যাবার পর এক দীর্ঘকাল কেটে গেছে অথচ আজ পর্যন্ত তাদের মনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জন্যে পূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা রয়েছে, তাঁর সমস্ত দাবীসমূহকে তাঁরা স্বীকার করেন এবং বিভিন্ন বৈঠকে প্রকাশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতাকে স্বীকার করে থাকেন। মনের মাঝে যদি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা না থাকতো তাহলে এতদিন পরে এসব কিভাবে অবশিষ্ট থাকতে পারে?

অজ্ঞদের প্রতি আশ্বাসবাণী

যেসব ফিতনা মনের বক্রতার কারণে উদ্ভুত সেগুলো ঈমানকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু যেসব ফিতনা অজ্ঞতাবশত সৃষ্টি হয় এর ফলে তাদের ক্ষতি হয় ঠিকই কিন্তু ঈমান রক্ষা পেয়ে যায় এবং এমন লোকদেরকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্তাআলা রক্ষা করে থাকেন। যে ব্যক্তি লোকদের অজ্ঞতার কারণে তাঁদের ঈমানের জন্যে পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায় এবং জামাতী স্বার্থের জন্যে বিপদ সাব্যস্ত হয় সে আমীর হবার যোগ্যই নয়। তাই এ বিষয়টিকে আমীরদেরও ভালভাবে উপলব্ধি করা উচিত।

আমীরের বিশেষ দায়িত্ব

এ বিষয়ে তদারকি করা আমীরেরও উচিত যেন সমগ্র জামাতকে তাদের অধিকার সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত করেন। তাঁরা যদি দেখতে পান যে, তাঁদের কোন কথায় বা কাজে কেউ দুঃখ পেয়েছে তাহলে তাঁরা যেন তা ভালবাসা ও সহমর্মিতা দ্বারা দূর করার চেষ্টা করেন। কিন্তু যদি নীতির প্রশ্ন হয় আর তাঁরা যদি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা না রাখেন তবে তাঁদেরকে যেন বুঝান হয়, তোমাদেরও অধিকার রয়েছে, তোমরা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে লিখে জানাও। যার কাছে লিখতে হবে আমি তোমাদেরকে তাঁর ঠিকানা দিচ্ছি। আমার বিরুদ্ধে নালিশ কর। তাঁকে ভালভাবে জানাও যে, আমি কি ভুল করেছি। তখন কেন্দ্র নিজেই তোমাকে প্রকৃত বিষয় বুঝিয়ে দিবে।

সুতরাং তাক্ওয়ার মাধ্যমে যদি কাজ করা হয় তাহলে জামাতী নিযামে কখনো কোন ধরনের অসুবিধা দেখা দিতেই পারে না। কিন্তু মনে রাখবেন, সমস্ত বিষয়ে তাকওয়ার মনোবৃত্তি প্রকৃত কাজ করে থাকে।

মতবিরোধ সম্পর্কিত ইসলামী নীতি

বিভিন্ন বৈঠকে তাকওয়ার আলোকে যদি কথা বলা হয় তাহলে কোন কথা কষ্টের কারণ হতে পারে না। মুত্তাকীদের মতবিরোধিতা সব সময়ে কল্যাণে রূপান্তরিত হয়। এ বিষয়টিকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) একটি বাক্যে এত সুন্দরভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন অথচ দুঃখের বিষয় কোন কোন লোক সে দিকে দৃষ্টি দেন না। তিনি বলেছেন,

'আমার উম্মতের মত বিরোধিতা রহমতস্বরূপ।'

আবার অন্যান্য কোন কোন হাদীসে মতবিরোধিতা সম্বন্ধে তিনি ভীষণ অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ এমন কিছু মতানৈক্য রয়েছে যেগুলো উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার মতবিরোধিতা। উপরোক্ত হাদীসে 'উম্মতী' শব্দটি বিষয়বস্তু অনুধাবন করার মূল চাবিকাঠি। যারা আমার 'উম্মতী' হবে অর্থাৎ যারা সত্যিকার অর্থে আমার গুণে গুণান্বিত হবে তাঁদের মতানৈক্য ও মতবিরোধিতা তাকওয়ার কারণে হবে এবং তাকওয়ার কারণে যেসব মতবিরোধিতার উদ্ভব হয় এর ফলশ্রুতিতে বিবেক-বুদ্ধি প্রখর ও উন্নত হয়, এর ফলশ্রুতিতে বিবেকের স্বাধীনতা মর্যাদা লাভ করে। আবার বিভিন্ন মতামত একে অপরের সাথে মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ আকার ধারণ করে, সব ধরনের অন্ধকার দূরীভূত হয়, নতুন নতুন আলোর উদ্ভব হয় এবং উন্নতির একটি সীমাহীন ধারা এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়। এরই নাম হচ্ছে রহমত। কিন্তু যে মতবিরোধিতা তাকওয়াশূন্য সেটি কিভাবে রহমত হবে? সেটি সব সময়ে যুলুম-অত্যাচারের ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় এবং শুধু অন্ধকার আর অন্ধকারের সৃষ্টি করে। এর ফলশ্রুতিতে দলাদলির উদ্ভব হয় এবং জাতীয় অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। শেষমেষ কথা 'তাকওয়া'তে এসেই থামে। তাকওয়ার আলোকে কথা বল্লে আল্লাহ্র ফযলে মতবিরোধিতাও আশীর্বাদে পরিণত হয়। আর তাকওয়া না থাকলে অন্ধ সমর্থনও অভিশাপের রূপ ধারণ করে।

অন্ধ সমর্থনের কুফল

আমি এ খুতবায় কিছুক্ষণ আগেও বর্ণনা করেছি যে, কোন কোন লোক বাহ্যত আমীরকে সমর্থন করে থাকেন ঠিকই কিন্তু তাকওয়াশূন্যভাবে। এর ফলশ্রুতিতে দ্বিমত পোষণকারীরা বাধ্য হয়ে একটি পৃথক দলের আকার ধারণ করেন। এক রকমভাবে তাদেরকে আহ্বান করা হয় যে, তোমরা ঐকবদ্ধ হও তা না হলে আমরা তো সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছি যে, আমীরের কথা ঠিক হোক বা না হোক তাঁকে সমর্থন করবই করব আর তাঁর দলভুক্ত হয়ে যাব। সুতরাং এ অর্থে আমীরের একটি দল সৃষ্টি হতে পারে তবে সেই দলটি তখন আর খোদার দল থাকবে না। আমীরদের উপরও একটি বিরাট দায়িত্বভার বর্তায়। তারা যেন সর্বদা এ বিষয়ে তদারকি করেন যে, পরামর্শের সময় খোদাভীতি যেন ছেয়ে থাকে এবং সব সময় সততাকে যেন প্রাধান্য দেয়া হয়। বন্ধুত্ব এবং সম্পর্ককে যেন প্রাধান্য দেয়া না হয়।

এ ধরনের আরও কিছু কথা আজকের খুতবায় তুলে ধরার ইচ্ছে ছিল যেন এ বিষয়টি শেষ হয়ে যায়; কিন্তু খুতবার নির্ধারিত সময়ের মাত্র কয়েক মিনিট বাকী আছে। এখনও অনেক কথা বলার আছে। ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে কোন এক সময়ে এ বিষয়ে আরও কথা বলব। তবে আর একটি কথা আমি আপনাদের বলতে চাই।

মজলিসে আলোচ্য বিষয় সুনির্ধারিত হতে হবে

কোন কোন বিষয় এমন রয়েছে যেগুলোকে বিনা কারণে আমীরগণ না জানার কারণে বা অনভিজ্ঞতার কারণে মজলিসে আমেলায় উত্থাপিত করে মতবিরোধিতার বীজ বপন করেন, যার ফলে পরিবেশ দূষিত হতে থাকে। যেমন ঃ কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক এমন এক কর্মকর্তা কোন এক জামাত পরিদর্শনে যাবেন যার জন্যে সকলের অন্তরে ভক্তি ও শ্রদ্ধা রয়েছে। তখন কখনো কখনো স্থানীয় আমীর বিষয়টিকে মজলিসে আমেলায় তুলে ধরেন যে, আগমনকারী অতিথিকে কোথায় রাখা যায়? আর এ কথার উপরেই মতবিরোধিতা আরম্ভ হয়ে যায়। কারও ইচ্ছা হয় তিনি যেন তার বাসায় থাকেন আবার অন্য একজন লোক তাঁকে নিজেদের বাড়িতে রাখতে ইচ্ছুক থাকেন। কারও কারও মতে অন্য কোথাও না রেখে হোটেলে রাখাই ভাল। আর এ ছোট বিষয় নিয়ে এমন তুমুল মতানৈক্যের

সৃষ্টি হয় যা বলার অপেক্ষা রাখে না। বড় বড় বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাও নির্বুদ্ধিতার কথা বলা আরম্ভ করেন। অথচ এটি এমন কোন বিষয়ই নয় যেটিকে মজলিসে আমেলায় তুলে ফিতনার উদ্ভব করা যায়। আগমনকারী অতিথি কোথায় উঠবেন এ সিদ্ধান্ত মজলিসে আমেলা গ্রহণই করতে পারে না। যেই বিষয়ে মজলিসের কোন ক্ষমতাই নেই সেটিকে এত ঘাঁটাঘাঁটির কি দরকার? মজলিসে আমেলায় কেবল এভাবে বিষয়টি উত্থাপিত হতে পারে, 'আপনারা আমাকে তার থাকার স্থান সম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান করুন। কিন্তু এটি আগমনকারীর সিদ্ধান্তের বিষয়। তিনি যেখানে চাইবেন উঠবেন। আপনাদের পরামর্শগুলো আমি তাঁকে পৌঁছে দিব।' কিন্তু এটি এমন বিষয় নয় যার সম্বন্ধে মজলিসে আমেলা সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারে। জামাতের কোথাও কোন নিয়মে একথা লিখা নেই যে, মজলিসে আমেলা আগমনকারীর থাকার স্থান নির্ধারণ করবে। মেহমানদারী পর্যন্ত আমীর সিদ্ধান্ত দিতে পারেন কেননা এটি তাঁর কাজের অংশ। জামাতের সেক্রেটারী যিয়াফত আছে, যিয়াফতের কাজ সেক্রেটারী যিয়াফতই করবেন। আমীর তাকে বলতে পারেন নি করণীয় আর কি করণীয় নয়। কিন্তু আমীর কেন্দ্রীয় অনুমোদন ছাড়া সেক্রেটারী যিয়াফতের কাজ অন্যের হাতে তুলে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন না। আমি দেখেছি, এ কারণেও ফিতনার উদ্ভব হয়েছে।

যার দায়িত্ব তাকে দিয়েই পালন করাতে হবে

প্রসঙ্গত একথার উল্লেখ করে ভালই হয়েছে। আমি এখন কথাটি বুঝিয়ে বলছি ঃ আমীরের পক্ষ থেকে সেক্রেটারী যিয়াফতের কাজ অন্য কারও উপর সোপর্দ করার সিদ্ধান্ত ঠিক সফর-খরচ খাতের বিল অন্য খাতে দেখানোর মতই একটি সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ সেক্রেটারী যিয়াফত আছেন কিন্তু যিয়াফতের কাজ অন্যকে দিয়ে করানো হচ্ছে)। আমীর খাত বদলানোর ক্ষমতা রাখে না। তাই যদি কোন কারণে সেক্রেটারী যিয়াফত আমীরের নির্দেশনার অধীনে কাজ করার অযোগ্য হয়ে থাকে তবে আমীরের উচিত সময়মত কেন্দ্রকে জানিয়ে নতুন সেক্রেটারীর অনুমোদন দেয়া। কিন্তু পদ কারও কাছে থাকবে আর কাজ অন্যকে দিয়ে করানোর মাধ্যমে তাকে অপমান করা হবে- এটি চলবে না। এর ফলশ্রুতিতে অশান্তি বাড়ে আর বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।

সুতরাং আমারতের কাজ সহজ নয়। আপনারা সবাই সম্মিলিতভাবে ভালবাসা ও তাকওয়ার সাথে আমীরকে সাহায্য করুন। আর যদি আমীর এসব বিষয়ে ভুল

করেন তাহলে যেহেতু আমি আপনাদের বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনারাও শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে তাঁকে বুঝান। কিন্তু এটি মনে রাখবেনঃ এতদ্‌সত্ত্বেও যদি আমীর তাঁর প্রাপ্ত ক্ষমতার সীমালংঘন করে এবং এমন ক্ষমতা প্রয়োগ করে যা তাকে দেয়াই হয় নি তখন জামাত সে বিষয়ে তাঁর আনুগত্য থেকে মুক্ত। এমন পরিস্থিতিতে অনতিবিলম্বে কেন্দ্রকে অবহিত করা জামাতের আবশ্যক দায়িত্ব যে, এমন ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সংশোধনযোগ্য ব্যাপার যদি হয়ে থাকে তাহলে সংশোধন করা কিংবা আগের আমীরকে অপসারিত করে নতুন আমীর নিয়োগ করা কেন্দ্রের উচিত ।

একটু আগেই বলছিলাম যে, অনেক সময় সরলতাবশত আমীর এটি বুঝেন না যে, কোন্ পরামর্শ কী ধরনের গুরুত্ব বহন করে? এ বিষয়কে আরও খুলে বলা দরকার। মজলিসে আমেলার পরামর্শ নেয়া বারণ নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মজলিসে আমেলায় বিভিন্ন বিষয়াদি উপস্থাপন করা এবং মজলিসের পরামর্শ নেয়া আমীরের কর্তব্য। কিন্তু এ বিষয়ে (মেহমানের থাকার বিষয়ে) সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা মজলিসে আমেলার নেই। তাই, যেখানে সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা মজলিসে আমেলার নেই সেখানে তারা আমীরকে এ কথা বলতে পারেন না যে, যেহেতু আপনি আমাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েছিলেন সে জন্যে তাঁকে (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় অতিথিকে) সেই জায়গায় রাখুন যেখানে আমাদের বেশির ভাগ সদস্যের রায় ছিল। এ ধরনের সিদ্ধান্তের বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোন দূরবর্তী সম্পর্কও নেই। যেসব পরামর্শ দেয়া হয় আমীর সেগুলোকে একত্র করে আসন্ন অতিথিকে লিখে দিন যে, এ সব পরামর্শ ও মতামত পেয়েছি, আপনার ইচ্ছা আপনি যেখানে খুশী উঠবেন। কিন্তু মতামতগুলো একবার দেখে নিন। এমন যদি করা হয় তাহলে কোথাও অপ্রিয় ঘটনা ঘটতে পারে না। আমার মনে আছে, ওয়াক্‌ফ জাদীদ, খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আনসারুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জামাতী সফরে অনেক সময় এ ধরনের ঘটনা আমার সাথেও ঘটত। সফরের শেষ দিকে লোকে আসত আর বলত, আমরা তো আপনাকে অমুক জায়গায় রাখার জন্য বলেছিলাম কিন্তু তারা এরকম ব্যবস্থা করেছেন। আমি তাদেরকে বলতাম, তোমরা বলেছিলে ঠিকই। কিন্তু তোমাদের এ ক্ষমতা কে দিয়েছিল যে, তোমরা এত নির্ভরযোগ্য হয়ে যাও আর শুধু তোমাদেরই ইচ্ছা চলে। সেখানে রাখেন নি তাতে কি হয়েছে? কষ্ট হলে আমার হয়েছে, তোমাদের কষ্ট হচ্ছে কেন? আমি সানন্দে এটিকে গ্রহণ করেছি। ব্যাপারটি এখানেই শেষ। এখন মানুষের কানে কানে কিংবা আমার

কানে এসব কথা বলে বেড়ানোর কোন অধিকার তোমাদের নেই,–"জনাব' আমরা তো আপনার জন্যে উত্তম স্থান প্রস্তাব করেছিলাম, অথচ এরা এমন লোক যারা জেনে শুনে আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে খারাপ জায়গায় আপনার থাকার ব্যবস্থা করেছে।" এসব কথা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও নিচু মানসিকতার পরিচয়। 'আহমদীয়া জামাত অতি উচ্চ মান ও মাকামসম্পন্ন জামাত, এটি আল্লাহ্‌র জামাত। খোদাতুষ্টির কথাবার্তা বলুন, এমন কথা বলুন যা আল্লাহ্‌ওয়ালাদের মানায়। নিজের মান ও মাকামকে চিনতে শিখুন এবং সেই মাকামে প্রতিষ্ঠিত থাকুন যা আপনাদের কাছে আশা করা হয়। তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ কোন ধরনের ফিতনা আপনাদের মাঝে ছড়াতে পারবে না। আল্লাহআআলা আমাদেরকে এ মাকাম অর্জনের তৌফীক দান করুন, আমীন।

- ঃ -

জামাতের কর্মকর্তাদের প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর ঐতিহাসিক নির্দেশাবলী

(হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর ৫-১২-২০০৩ তারিখের খুতবার আলোকে)

- তওবা ও ইস্তিগফার বেশি বেশি পাঠ করুন।
- স্বভাব ও আচরণে নম্রতা ও মাধুর্য সৃষ্টি করুন।
- নিজ নিজ দায়িত্বের প্রতি অধিক মনোযোগী হোন। জামাতি নেযাম কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিজের আমিত্ব, অহমিকা ও নিজের খেয়াল-খুশিকে বিসর্জন দিয়ে খেদমত করার প্রতি অনুরাগী হোন।
- ছোট ছোট কথায় রাগান্বিত হওয়ার স্বভাব পরিহার করুন।
- পারস্পরিক স্নেহ-মমতা ও ভালবাসার সম্পর্ক বৃদ্ধি করুন।
- অন্যান্য সকলের জন্যে দোয়ার অভ্যাস বাড়ান।
- জামাতের নেতারা জামাতের সেবক। মঞ্চে বসার বা অহংকারের সাথে পদচারণার জন্যে আপনাদেরকে নির্বাচিত করা হয় নি।
- সকল স্তরের কর্মকর্তা (ওহ্দাদার)-গণ যুগ-খলীফার প্রতিনিধি। সুতরাং যুগ-খলীফার আকাঙ্ক্ষানুযায়ী সকলের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের শরীক হোন। খলীফা কারও সম্বন্ধে রিপোর্ট চাইলে ধীরে-সুস্থে চিন্তা-ভাবনা করে এবং যাচাই-বাছাই করে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে সঠিক রিপোর্টটি পেশ করুন।
- হাদীস থেকে জানা যায়, যাদেরকে মানুষের উপর নেগরান বা তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব দেয়া হয় তারা যদি তা সঠিকভাবে পালন না করে তা হলে তাদের জন্যে জান্নাত হারাম।
- যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে এবং প্রাপ্য ... দিতে হবে।
- জামাত কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করলে আল্লাহ্তাআলা অভাব-অভিযোগ দূর করবেন না - আল্ হাদীস।

- জামাতের লোকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সেক্রেটারী উমুরে আমার অন্যতম দায়িত্ব। লোকদের কাজে লাগাবার জন্যে উৎসাহিত করা ও কাজে লাগিয়ে দেয়াও তার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।
- যেসব ছেলে বা মেয়ে স্কুলে যায় তাদের তালিকা প্রস্তুত করা সেক্রেটারী তা'লীমের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। যারা যাচ্ছে না এর কারণ বের করা এবং সঙ্গত কারণ থাকলে এর বিহিত-ব্যবস্থা করা। সকলকে কমপক্ষে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করতে হবে। উচ্চ শিক্ষা অর্জন করার জন্যে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চায় তাদের সঙ্গতি না থাকলে তাদের ব্যাপারে জামাতী সাহায্য সহযোগিতা সক্রিয় করতে হবে।
- আদেশ দেয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে নিম্নস্থরা সে আদেশ পালন করতে পারবে কি পারবে না। আর এমনভাবে অগ্রসর হতে হবে যেন তারাও সাথে চলতে পারে। আর প্রত্যেক আদেশের পেছনে উদ্দেশ্যটা তাদের ভালভাবে বুঝিয়ে দিলে তারা কাজে উৎসাহ পাবে।
- স্নেহ-ভালবাসার সাথে আদেশ দিতে হবে। কড়া বা কর্কশ মেজাযের আচরণ করলে অধীনস্থরা এক সময় সট্‌কে পড়বে। তাদের দিয়ে আরব্ধ কাজ করানো যাবে না।
- মধ্যম পন্থা ও হিকমত বা প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা, দু'টির সমন্বয় জামাত ও জাতির মাঝে উন্নতির আত্মা সৃষ্টি করে।
- কোন সদস্য কোন বিষয় মরকযে বা কেন্দ্রে আবেদন করলে প্রেসিডেন্ট সাহেবদের, তা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি কেন্দ্রে তার মতামত দিয়ে পাঠানো আবশ্যক। ফেলে রাখা উচিত নয়। দরখাস্ত কেন্দ্রে পাঠানোর অনুপযুক্ত মনে করলে তিনি সংশ্লিষ্ট সদস্যকে ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে বুঝিয়ে দেবেন যে, এটা পাঠানো ঠিক হবে না।
- আমীর বা প্রেসিডেন্টকে সর্বদা মনে রাখতে হবে, তিনি যুগ-খলীফার প্রতিনিধি। সুতরাং তিনি সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করছেন কি না সে বিষয়ে আত্মবিশ্লেষণ করবেন।
- আমাদের জামাতের নেযাম মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ঘুচাবার জন্য সৃষ্টি হয়েছে।
- একটি হাদীসে বলা হয়েছে; 'রসূলে করীম (সঃ) দোয়া করেছেন, 'হে আল্লাহ্! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের মাঝে কোন অংশের শাসন-ক্ষমতা লাভ করে এবং সে আমার মুসলমানদের ওপর কঠোরতা প্রদর্শন করে তুমিও তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করো! আর যে ব্যক্তি শাসন-ক্ষমতা পেয়ে মানুষের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করে তুমিও তার প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করো।"

- আমাদের ওহদাদারগণ, আমীর, প্রেসিডেন্ট বা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী-সকলের প্রধান কাজ হলো, নিজেদের ও জামাতের সকল সদস্যের মাঝে জামাতী নেযামের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ সৃষ্টি করা আর জামাতের সদস্যগণও এটা বংশপরম্পরায় অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করবেন।
- হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন, আমি জামাতের ওহদাদারগণের উদ্দেশ্যে যেসব নসীহত করি তা সকলের ওপরে প্রযোজ্য।
- যখন কেউ ওহদাদার নির্বাচিত হন তখন তিনি একজন সেবক (খাদেম) হিসেবে দায়িত্ব নিবেন।
- ওহদাদারগণ যত বেশি সাধারণ সদস্যদের সাথে আন্তরিকতা ও ভালবাসার সম্পর্ক রাখবেন তত বেশি সাফল্য লাভ হবে তথা জামাতের নেযাম শক্তিশালী হবে। উভয় পক্ষের মাঝে যত বেশি সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে নেযাম তত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে। যুগ-খলীফাও চিন্তামুক্ত হতে পারবেন যে, জামাতী নেযাম সঠিক ও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছে।
- অনিচ্ছা সত্ত্বেও পদ দখল করে থাকায় জামাতের নেযাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে বেশি। কাজ করতে অপারগ হলে সদস্য পদ ছেড়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়া উত্তম।
- ওহদাদারগণের মাঝে কোন বৈষম্য করবেন না। প্রত্যেকে প্রত্যেককে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবেন। এটা জাগতিক প্রতিষ্ঠান নয়। ওহদাদারগণ আমীরকে মান্য করবেন আর আমীরও মজলিসে আমেলার মতামতকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবেন, গুরুত্ব দিবেন। কোন অধীনস্থ কর্মচারী বা কর্মকর্তা পরামর্শ দিলে তা-ও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন। তুচ্ছ মনে করবেন না।
- প্রত্যেককে অনেক বড় মনের অধিকারী হতে হবে। কারও পরামর্শ তুচ্ছ জ্ঞান করা ঠিক নয়। নবী করীম (সঃ)-ও পরামর্শ গ্রহণ করেছেন।
- জামাতের প্রত্যেক ওহ্দাদার একজন সম্মানিত ব্যক্তি। ছোট বড় ভেদাভেদ করবেন না। কে দীর্ঘ দিন পদে আছেন বা কে স্বল্প দিন আছেন এ বাছ-বিচার করা ঠিক নয়। কম বয়সী ওহ্দাদারকেও তুচ্ছ-জ্ঞান করা ঠিক হবে না।
- কাযার ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক কাযীকে পূর্ব-ধারণা মুক্ত হয়ে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে হবে। সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। নিজের অন্তর ও বিবেকের নিকট স্বচ্ছ থাকতে হবে।

☞ কুরআন সুন্নাহ্‌র আলোকে ফয়সালা বা রায় দিতে হবে। এতে কোন ইঙ্গিত না পাওয়া গেলে খুব চিন্তা-ভাবনা করে দোয়ার মাধ্যমে রায় দিতে হবে।

☞ গতকালের দেয়া সিদ্ধান্ত যদি আজ ভুল মনে করেন তাহলে তা শোধরিয়ে দিতে একটুও দ্বিধাবোধ বা লজ্জা করা উচিত নয়। অকপটে নিজের ভুল স্বীকার করাতে কোন অপরাধ নেই।

☞ বাদী পক্ষকে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করার যথেষ্ট সুযোগ দেয়া আবশ্যক।

☞ কারও ওহ্‌দাদার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকা ঠিক নয়। কারও নাম যদি নির্বাচনের সময় প্রস্তাবিত হয়েও যায় তাহলে তার নিজের পক্ষে ভোট দেয়ার অধিকার নেই। "আল্লাহ্‌র কসম! কোন অঞ্চলের শাসন-ক্ষমতা আমরা এমন ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করি না, যে এর জন্য আবেদন করে বা এর লোভ করে"-আল্ হাদীস।

☞ 'আকাঙ্ক্ষা ছাড়াই যদি কাউকে পদ দেয়া হয় তাহলে এর সাথে আল্লাহ্‌র সাহায্য থাকবে'-আল্ হাদীস।

☞ "একথা স্মরণ রাখ, তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র) জন্য কাজ করবে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কারের আশা করবে। মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা কামনা করো না" - হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)।

☞ কোন জেদি লোকও যদি আপনার কাছে আসে তাহলে তাকেও ভালবাসার সাথে বুঝাতে চেষ্টা করুন। 'পুরোপুরি পরিশ্রম ও আন্তরিকতার সাথে পরিশ্রম করার অভ্যেস করুন' - হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)।

হুযূর আকদস (আইঃ)-এর ভাষণের সারাংশ

(১) সদস্যগণ নিজেরা আনুগত্যের উত্তম নমুনা দেখাবেন, নিজের উপরস্থ কর্মকর্তার পুরোপুরি আনুগত্য করবেন। আপনি যদি আপনার উপরস্থ কর্মকর্তার আনুগত্য করেন, দেখবেন, আপনার অধীনে যারা তারাও আপনার আনুগত্য ও ইয্‌যত করছেন।

(২) স্মরণ রাখবেন, সকলের সাথে নম্রতা দেখাবেন। সকলের মন জয় করতে হবে, তাদের সুখ-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে, তাদের কাজ করে দিতে হবে। আপনি যদি এমন না করেন এর অর্থ এই যে, এমন ওহ্‌দাদারের মনে অহংকার আছে।

(৩) আমীর সাহেবান, প্রেসিডেন্ট সাহেবান এবং কেন্দ্রীয় কর্মচারী-কর্মকর্তারা দোয়া করবেন যেন আপনাদের সাথের বা অধীনস্থ কর্মচারী, কর্মকর্তারাও যেন ভদ্র ও সুশীল স্বভাবের হন, নেযামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আনুগত্য যেন তাদের মাঝে থাকে।

(৪) কখনও কোন বিষয়ে জামাতের কোন ব্যক্তির সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করবেন না।

(৫) এ কথাও স্মরণ রাখবেন, কিছু লোক বড়ই বক্র স্বভাবের হয়ে থাকে। আমি জানি, এরা আমীর বা ওহ্দাদারদের ঘাম ছুটিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। কিন্তু এরপরও যতদূর সম্ভব তাদের বেআদবী সহ্য করবেন। তাদের পক্ষ থেকে যত কষ্টই পেতে থাকুন- কোন প্রকার অভিযোগ করবেন না, প্রতিশোধের কথা কখনও মনে আনবেন না। তাদের জন্য দোয়া করুন ও আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করুন। নেযামে জামাতের দৃঢ়তা ও হেফাযত সবার উপরে থাকা চাই। এর জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

কখনই নিজের আশপাশে যারা জ্বী-হুযূর (Yes Sir) করে তাদেরকে একত্র হতে দিবেন না। যখনই কোন ওহ্দাদারের উপর এদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এরপর তার কাছ থেকে কোন ন্যায়বিচার আশা করা যায় না। এমন ওহ্দাদার এদের হাতের খেলার পুতুল বনে যায়। এ জন্যই আঁ হযরত (সঃ) দোয়া করেছেন, 'কখনই মন্দ পরামর্শদাতারা যেন একত্র না হয়'।

আগেও বলেছি, যতক্ষণ নেযামের সম্মান ও মর্যাদা বিপন্ন না হয় ততক্ষণ ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করবেন। তাদের জন্য ইস্তিগফার করতে থাকবেন যেন তাদের সংশোধন হয়।

উপরে তো ওহ্দাদারদের কথা বললাম। অবশেষে জামাতের সকল সদস্যদের জন্য বলছি ঃ

আপনাদের উপরও বড় দায়িত্ব রয়েছে। যারা মজলিসে আমেলার সদস্য নন আপনাদের কাজ কেবল আনুগত্য, আনুগত্য এবং আনুগত্য এবং এর সাথে দোয়া করা। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের তৌফীক দান করুন।

Responsibilities of the Executives of Nezam-e-Jamaat

Bengali version of Friday Sermon

Delivered by
Hazrat Mirza Tahir Ahmad Khalifatul Masih Rabe (Rahe)
on 13-9-1991 at Nunspeet, Holland
and
Friday Sermon delivered by
Hazrat Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih Al-Khames (atba)
on 05-12-2003

Translated by
Abdul Awwal Khan Chowdhury, Murabbi Silsila
and
Mohammad Mutiur Rahman

Published by
Ahmadiyya Muslijm Jamaat, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211